

❏ ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১. পরিচিতি ও আলোচিত কারণসমূহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১. ৫. আলোচিত তৃতীয় কারণ: ওহাবী মতবাদ

‘ওহাবী মতবাদ’-কে জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে অনেক গবেষক উল্লেখ করছেন। সৌদি আরবের ধর্মীয় নেতা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২ খৃ) প্রচারিত মতবাদকে ‘ওহাবী’ মতবাদ বলা হয়। তিনি তৎকালীন আরবে প্রচলিত কবর পূজা, কবরে সাজদা করা, কবরে বা গাছে সুতা বেঁধে রাখা, মানত করা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কার, শিরক, বিদ‘আত ইত্যাদির প্রতিবাদ করেন। তাঁর বক্তব্য শুধু প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উপরন্তু তাঁর বিরোধীদের তিনি মুশরিক বলে অভিহিত করতেন। ১৭৪৫ খৃস্টাব্দে বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের অনতিদূরে অবস্থিত দিরইয়্য নামক ছোট গ্রাম-রাজ্যের শাসক আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ (মৃত্যু ১৭৬৫) তাঁর সাথে যোগ দেন। তাদের অনুসারীরা তাদের বিরোধীদেরকে মুশরিক বলে গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালন শুরু করেন। ১৮০৪ সালের মধ্যে মক্কা-হিজায সহ আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ ‘সাউদী’- ‘ওহাবী’দের অধীনে চলে আসে।

তৎকালীন তুর্কী খিলাফত এ নতুন রাজত্বকে তার আধিপত্য ও নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে করেন। কারণ একদিকে মক্কা-মদীনা সহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্যদিকে মূল আরবে স্বাধীন রাজ্যের উত্থান মুসলিম বিশ্বে তুর্কীদের একচ্ছত্র নেতৃত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তুর্কী খলীফা দরবারের আলিমগণের মাধ্যমে ওহাবীদেরকে ধর্মদ্রোহী, কাফির ও ইসলামের অন্যতম শত্রু হিসেবে ফাতওয়া প্রচার করেন। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারাভিযান চালানো হয়, যেন কেউ এ নব্য রাজত্বকে ইসলামী খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত মনে না করে। পাশাপাশি তিনি তুর্কী নিয়ন্ত্রণাধীন মিসরের শাসক মুহাম্মাদ আলীকে ওহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। মিশরীয় বাহিনীর অভিযানের মুখে ১৮১৮ সালে সাউদী রাজত্বের পতন ঘটে। এরপর সাউদী রাজবংশের উত্তর পুরুষেরা বারংবার নিজেদের রাজত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সর্বশেষ এ বংশের ‘আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রাহমান আল-সাউদ (১৮৭৯-১৯৫৩) ১৯০১ থেকে ১৯২৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বর্তমান ‘সৌদি আরব’ প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম বিশ্বের যেখানেই সংস্কারমূলক কোনো দাওয়াত বা আহবান প্রচারিত হয়েছে, তাকেই সৌদি ‘ওহাবীগণ’ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বলে দাবি করেছেন। অপরদিকে তুর্কী প্রচারণায় ‘ওহাবী’ শব্দটি মুসলিম সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য শব্দে পরিণত হয়। তাদেরকে অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের চেয়েও অধিকতর ঘৃণা করা হয়। ফলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বৃটিশ বিরোধী আলিমদেরকে ওহাবী বলে প্রচার করতেন; যেন সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা না থাকে। এছাড়া মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরকে নিন্দা করার জন্য ‘ওহাবী’ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের সমসাময়িক ভারতীয় মুসলিম সংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২ খু)। তাঁর মত-প্রচারের প্রথম দিকে ১৭৩১ খৃস্টাব্দে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং তিন বৎসর তথায় অবস্থান করেন। এরপর দেশে ফিরে তিনি ভারতে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনিও কবর পূজা, পীর পূজা, কবরে মানত করা, কবরবাসী বা জীবিত পীর বা ওলীগণের কাছে বিপদমুক্তির সাহায্য চাওয়া ও অন্যান্য শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, মাযহাবী বাড়াবাড়ি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে 'ওহাবী' বলে চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তবে ভারতের সর্বপ্রথম সংবিধিবদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ 'ওহাবী' নেতা ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র শাহ আব্দুল আযীযের (১৩৪৬-১৮২৩ খু) অন্যতম ছাত্র সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী (১৭৮৬-১৮৩১ খু)। তিনি সমগ্র ভারতে মাযার, দরগা, ব্যক্তি পূজা, মৃত মানুষদের নামে মানত, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। এছাড়া তিনি বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮২১ খৃস্টাব্দে তিনি হজ্জে গমন করেন। প্রায় তিন বৎসর তথায় অবস্থানের পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন।

১৮২৬ খৃস্টাব্দে তিনি বৃটিশ ভারত থেকে 'হিজরত' করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমন করে সেখানে 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং নিজে সেই রাষ্ট্রের প্রধান হন। এরপর তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সেখানে একত্রিত হয়ে বৃটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পরে ১৮৩১ খৃস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তী প্রায় ৩০ বৎসর সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অনুসারীগণ বৃটিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বিচ্ছিন্ন জিহাদ ও প্রতিরোধ চালিয়ে যান।

১৮০৩-৪ সালে "ওহাবী"-গণ মক্কা-মদীনা দখল করে এবং তথাকার প্রাচীন মাজার-কেন্দ্রিক সৌধগুলি ভেঙ্গে ফেলে। এতে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর অনুসারীগণ "ওহাবী"-দের মতই একইভাবে শিরক, কুফর, বিদ'আত, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রতিবাদ করতেন। এভাবে তাদের মতামতের সাথে "ওহাবী"-দের মতামতের বাহ্যিক সাদৃশ্য ছিল। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় গমন করেন। ইংরেজ শাসকগণ সুকৌশলে প্রচার করে যে, 'স্বাধীনতার নামে যারা আপনাদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে আসলে তারা ইসলামের শত্রু এবং নবী ও সাহাবাদের অপমানকারী দল, এদের নাম ওহাবী, এরাই আপনাদের প্রিয় রাসুলের (ﷺ) বংশধরদের কবরগুলি ধ্বংস করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে ... আর সৈয়দ আহমদ তাদেরই এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এবং এরা সবাই ওহাবী তাই এরাও আপনাদের শত্ৰুয় পীরবুজুর্গ ও পূর্বপুরুষদের কবর ভাঙতে চায়...।[২]

এভাবে বৃটিশ সরকার বুঝান যে, প্রকৃত ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কোনো ক্ষোভ নেই। প্রকৃত ইসলাম ও মুসলিমদেরকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন। শুধু বিভ্রান্ত ওহাবী সম্প্রদায়ের মানুষদেরকেই তারা দমন করছেন ও শাস্তি দিচ্ছেন। কাজেই এতে সাধারণ ভাল মুসলিমদের বিরক্ত হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর শিষ্যদের থেকে ভারতে বিভিন্ন সংস্কারমুখী ধারার জন্ম নেয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে অনেকে নির্ধারিত মাযহাব অনুসরণ অস্বীকার করে নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে দাবি করেন। তাঁর শিষ্য জৌনপুরের পীর মাওলানা কারামত আলী একটি সংস্কারমুখী ধারার জন্ম দেন। ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বাক্র সিদ্দীকীও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর মতানুসারী ও তাঁর প্র-শিষ্য ছিলেন। দেওবন্দী আলিমগণও তাঁরই শিষ্যদের থেকে শিক্ষা

লাভ করেছেন। এদেরর সকলকেই প্রতিপক্ষগণ ও ঔপনিবেশিক সরকার ‘ওহাবী’, “রঙিন ওহাবী” বা “বর্ণচোরা ওহাবী” বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অন্যতম শিষ্য ও সমসাময়িক সংস্কারক মীর নেসার আলী ওরফে তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১) এবং সমকালীন অন্য সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। এদেরকেও ওহাবী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এদের আন্দোলন ও প্রতিরোধকে ওহাবী আন্দোলন বলা হয়েছে। “ওহাবী” শব্দের ব্যবহার বুঝতে একটি উদাহরণ পেশ করছি। মীর নিসার আলী ওরফে তিতু মীর ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ২৪ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৩ সালে হজ্জের সময় মক্কায় সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর মুরীদ হন। দেশে ফিরে তিনি তাঁর এলাকার মানুষদের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রচার করেন। তিনি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বললেও কখনোই হিন্দু ধর্ম, ধর্মাবলম্বী বা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নি। কিন্তু তাঁর শিক্ষায় সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ধর্মপালন বৃদ্ধি পাওয়াতে এলাকার হিন্দু জমিদারগণ ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা সাধারণ মুসলিম প্রজাদেরকে জানান যে, প্রকৃত ইসলামকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন। তবে ওহাবী মতবাদকে তারা দমন করতে চান। যুগযুগ ধরে মুসলিমগণ হিন্দুদের মতই নাম রেখেছেন, দাড়ি কেটেছেন, গোঁফ রেখেছেন, মসজিদ বানানোর জন্য ব্যস্ত হন নি এবং গোহত্যা করেননি। তিতুমীর ওহাবী মতানুসারে দাড়ি রাখতে, গোঁফ কাটতে, মুসলমানী নাম রাখতে, মুসলমানদের গ্রামে মসজিদ বানাতে ও কুরবানীর নামে গোহত্যা করতে উৎসাহ দিচ্ছে। এতে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে। এজন্য ওহাবী মতবাদ দমন করা অতীব জরুরী। এদের দমনের কারণে “ভাল” মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার কোনোই কারণ নেই।

এজন্য তারাগুলিয়ার জমিদার রামনারায়ন বাবু, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, নগরপুরের জমিদার গৌড়প্রসাদ চৌধুরী ও অন্যান্য প্রখ্যাত জমিদার সমবেতভাবে ৫টি বিষয়ে নোটিশ জারি করেন: “(১) যাহারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ওহাবী হইবে, দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাটিবে, তাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা এবং ফি গোঁফের উপর পাঁচ সিকা খাজনা দিতে হইবে। (২) মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে। (৩) পিতা-পিতামহ বা আত্মীয়- স্বজন সন্তানের যে নাম রাখিবে সে নাম পরিবর্তন করিয়া ওহাবী মতে আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে। (৪) গোহত্যা করিলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া নেওয়া হইবে, যেন সে ব্যক্তি আর গোহত্যা করিতো না পারে। (৫) যে ব্যক্তি ওহাবী তিতুমীরকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিবে তাহাকে তাহার ভিটা হইতে উচ্ছেদ করা হইবে।”[৩]

বস্তুত, তুর্কী খিলাফাত ও বৃটিশ সরকারের ব্যাপক প্রচারের কারণে “প্রকৃত ইসলাম” ও “ওহাবী ইসলামের” এ বিভাজন পাশ্চাত্য গবেষকদের কাছে সার্বজনীনতার রূপ পেয়েছে। বিশ্বের যে কোনো স্থানে সংস্কার আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, উপনিবেশ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বা পাশ্চাত্য বিরোধী আন্দোলনে ধার্মিক মুসলিম, আলিম, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা পীর-মাশাইখের সম্পৃক্ততা থাকলেই তাকে “ওহাবী” বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়।

ওহাবী ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামের এ বিভাজনের ক্ষেত্রে অনেক পাশ্চাত্য গবেষক প্রকৃত ইসলামকে “সূফী ইসলাম” বলে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে, সূফী ইসলাম অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক ও উদার। প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন যে, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার মুসলিম ও অমুসলিম সমাজের অগণিত সূফী দরবারে

নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষ একত্রিত হচ্ছেন, যিক্র, ওয়ীফা, সামা-কাওয়ালী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন এবং তবারুক ও দুআ গ্রহণ করছেন। এ সকল দরবারে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি আলোচনা করা হয় না।

আমাদের দেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা সূফী ইসলামের দুটি পর্যায় দেখতে পাই। আমরা দেখি যে, অনেক মুসলিম তাসাউফ ও সূফীবাদের নামে পীর-মাশাইখকে আল্লাহর অবতার বা বিশেষ “ঐশ্বরিক” সম্পর্ক বা ক্ষমতার অধিকারী বলে গণ্য করেন, তাদেরকে সাজদা করেন, তাদের কবর-মাযার বা সমাধি সাজদা করেন, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি শরীয়তের আহকাম পালনকে গুরুত্বহীন মনে করেন এবং গান-বাজনা ও নৃত্যগীতিকে সূফী ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে গণ্য করেন। এরা নিজেদেরকে প্রকৃত সূফী ও প্রকৃত সুন্নী বলে দাবি করেন। যারা পীর সাজদা, করব সাজদা, গানবাজনা, ধুমপান ইত্যাদির প্রতি আপত্তি প্রকাশ করেন বা শরীয়ত পালনের বাধ্যবাধকতার কথা বলেন তাদেরকে এ পর্যায়ের সূফীগণ “ওহাবী” এবং “ওলীগণের দুশমন” বলে কঠোরভাবে নিন্দা করেন। অনেকে তামাক, গাজা ইত্যাদি সেবন বা ধুমপানকে সুন্নী ইসলাম ও সূফী ইসলামের মৌলিক পরিচয় বলে গণ্য করেন এবং ধুমপান বিরোধীদেরকে ওহাবী ও ওলীগণের দুশমন বলে নিন্দা করেন। অন্য অনেক মুসলিম পীর-সাজদা, করব-সাজদা, গান-বাজনা ইত্যাদি কর্মকে কঠিনভাবে নিন্দা করেন, শরীয়ত প্রতিপালনকে সূফী ইসলামের মূল বিষয় বলে গণ্য করেন এবং শরীয়ত প্রতিপালনের পাশাপাশি পীর-মাশাইখের নিকট তরীকত শিক্ষা করেন ও পালন করেন। প্রথম পর্যায়ের সূফী ও মারফতীগণের মতানুসারে এরা ওহাবী ও সূফী ইসলামের দুশমন। তবে এরা নিজেদেরকে প্রকৃত সূফী ও সুন্নী বলে দাবি করেন এবং প্রথম পর্যায়ের মানুষদেরকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন।

এ পর্যায়ের তাসাউফ-পন্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ওরস, ঈসালে সাওয়াব, মীলাদুন্নবী, সীরাতুন্নবী, যিকরের পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যায়ের সূফীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সকল মতভেদের ভিত্তিতে এ পর্যায়ের সূফীগণের একদল আরেকদলকে ওহাবী, নবীর দুশমন বা ওলীগণের দুশমন বলে নিন্দা করেন এবং নিজেদেরকে প্রকৃত সুন্নী ও প্রকৃত সূফী বলে দাবি করেন, যদিও সকলেই পীর-মুরিদী ও তাসাউফে বিশ্বাস করেন ও বিভিন্ন তরীকা অনুসরণ করেন। পাশ্চাত্যের খৃস্টানগণ প্রকৃতিগতভাবেই প্রথম পর্যায়ের সূফী ইসলাম ও এর অনুসারীদের ভালবাসেন। কারণ তাদের “মানসিকতার” সাথে এদের “মানসিকতার” খুবই মিল। ইউরোপ-আমেরিকা ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে এরূপ সূফীদের মাজলিস- দরবার ও খানকা-মাজারে তারা আগমন করেন, গান-বাজনা ও আধ্যাত্মিক চর্চায় অংশ নেন। এ সকল সূফীও এদেরকে অত্যন্ত ভালবেসে গ্রহণ করেন। স্বভাবতই পাশ্চাত্যের মানুষেরা বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে এরূপ সূফী ইসলামের প্রসার কামনা করেন। এরূপ সূফী ইসলামের প্রসারই সকল ধর্মের ও ধর্মহীন মানুষদের মধ্যে অনাবিল শান্তি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করেন। “সভ্যতার সংঘাতের” নামে ইসলামী দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রথমে ঢালাওভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। কিন্তু তারা দেখেন যে, এতে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাড়ছে। তখন তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে কাউকে পক্ষ ও কাউকে বিপক্ষে নিতে চান। এজন্য প্রথমে তারা লিবারেল (liberal) বা উদার ও (fundamentalist) অর্থাৎ মৌলবাদী বা কটরপন্থী বলে ভাগাভাগি করেন। এরূপ ভাগাভাগি মুসলিম দেশগুলিতে তেমন কোনো বাজার লাভ করে না। এজন্য বিগত কয়েক বছর যাবত তারা নতুন একটি ভাগাভাগি বাজারজাত করতে চেষ্টা করছেন, তা হলো সূফী

ইসলাম ও ওহাবী ইসলাম।

মুসলিম দেশগুলিতে সূফীগণের প্রভাব ও “ওহাবী” শব্দটির প্রতি মুসলিমদের ঘৃণার বিষয়টি তারা জানেন। বৃটিশ সরকার ও হিন্দু জমিদারগণ যেভাবে সাইয়েদ আহমদ, তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ ও অন্যান্য সকল ধর্মীয় সংস্কার ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে “ওহাবী” বলে চিত্রিত করে সাধারণ মুসলিমদের কাছে ঘৃণিত করার চেষ্টায় অনেকটা সফলতা লাভ করেছিলেন, তেমনি তারা তাদের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক সকল ইসলামী কর্মকান্ড ও ব্যক্তিত্বকে “ওহাবী” রূপে চিত্রিত করতে চেষ্টা করছেন। অন্তত সুন্নীওহাবী বা সূফী-ওহাবী বিতর্ক ও সজ্জাত উল্লেখ দিতে পারলে ইসলামী দাওয়াত, শিক্ষা বিস্তার, অশ্লীলতা-মাদকতার প্রতিবাদ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আলিম বা ইসলামপন্থীদের উত্থান নিশ্চিতরূপেই ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হবে। তারা মূলত সূফী ইসলাম বলতে প্রথম পর্যায়ের সূফীদের বুঝছেন। কারণ, দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীদের মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী, তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রমুখের মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটতে পারে, যাদের ক্ষমতায়ন তাদের স্বার্থ রক্ষা করে না। তারা বিশ্বাস করেন যে, প্রথম পর্যায়ের সূফীদের উত্থানই মুসলিম মানসিকতা থেকে জঙ্গিবাদের মূল উৎপাতন করতে সক্ষম এবং এ পর্যায়ের সূফী ইসলামই বিশ্বের মানুষদেরকে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও ধর্মীয় সংঘাত থেকে রক্ষা করে সকল ধর্মের শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে। শুধু তাই নয়, এদের প্রতিষ্ঠা বিশ্বের প্রধান দুটি ধর্ম: খৃস্টধর্ম ও ইসলামকে একেবারেই কাছাকাছি করে দিতে পারে।

বস্তুত প্রথম পর্যায়ের সূফীগণ এবং পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীগণকে “প্রকৃত ওহাবী” বা “বর্ণচোরা ওহাবী” বলে বিশ্বাস করেন। এদের হাতে তাদের স্বার্থ নিরাপদ নয় বলেও তারা জানেন। তবে মুসলিম দেশগুলিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের সূফীগণের প্রভাব সম্পর্কেও তারা সচেতন। এজন্য তার “সূফী ইসলামের” নামে প্রথম পর্যায়ের সূফীদের নেতৃত্বাধীনে ও তাদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে থেকে উভয় পর্যায়ের সূফীগণকে একত্রিত করে তাদেরকে “ওহাবী”-দের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করছেন। তারা বুঝাচ্ছেন যে, যারা ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র, বিচার, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার দাবি করছেন তারা মূলত ওলীগণের মাজারভাঙ্গা সৌদী ওহাবীগণের দালাল ও তাদের মতের অনুসারী। এরা ক্ষমতা লাভ করলে এরাও পীর-মাশাইখ ও কবর-মাজার ধ্বংস করবে। কাজেই এদেরকে প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ হোন। একথা নিশ্চিত যে, সাধারণ মুসলিম, আলিম ও পীর-মাশাইখ তাদের এরূপ প্রচারণায় প্রভাবিত হবেন। এছাড়া এ অযুহাতে ওহাবী-সুন্নী বিতর্ক ও হানাহানির প্রসার ঘটিয়ে মুসলিমদেরকে সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বা ইসলামী মূল্যবোধ প্রচারের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে বলে তারা মনে করছেন।

বস্তুত “ইসলাম” নামের যেমন ব্যাপক অপব্যবহার করা হয়েছে এবং ইসলামের নামে ইসলাম বিরোধী কর্ম করা হয়েছে ও হচ্ছে, তেমনি “সূফী” শব্দেরও ব্যাপক অপব্যবহার করা হয়েছে। তাসাউফ, সূফী, পীর, দরবেশ ও ওলীগণের নামে অনৈসলামিক কর্মকান্ডও ঘটেছে অনেক। তবে সর্বজন স্বীকৃত সূফী-দরবেশগণের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, তাঁরা সকলেই সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং সমাজ পরিবর্তনে তাঁদের ভূমিকা ছিল অপারিসীম। প্রায় সকল সূফী “তরীকা”-র মূল সূত্র হিসেবে আবু বাকর সিদ্দীক (রা) ও আলী (রা)-কে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত অমান্যকারী, ধর্মত্যাগী, ধর্মীয় অনাচারে লিপ্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁরা ছিলেন মুসলিম উম্মাহর পথিকৃতি। হাসান বসরী, ইবরাহীম আদহাম, জুনাইদ বাগদাদী, আব্দুল কাদির

জীলানী, আবু হামিদ গাযালী, মুজাদ্দিদ-ই আলফিসানী, শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী, এমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী, কারামত আলী জৌনপুরী, আবু বকর সিদ্দীকী ফুরফুরাবী (রাহিমাল্হুমুল্লাহ) ও অন্যান্য সকল সুপ্রসিদ্ধ সূফী-সাধক আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন, শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, কারাবরণ করেছেন বা শাহাদাত লাভ করেছেন।

আধুনিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে এদের কর্মপদ্ধতির পার্থক্য হলো ক্ষমতায় না যেয়ে ক্ষমতাসীনদের সংশোধনের চেষ্টা করা। এরা নিজেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করেননি বরং ক্ষমতাসীনদেরকে নসীহত করেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, ন্যায়ের পক্ষে উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, জনগণকে সচেতন করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক শাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধে শরীক হয়েছেন এবং এ সকল কর্মকাণ্ডে যে সকল ব্যক্তি বা দলকে অপেক্ষাকৃত ভাল বলে মনে করেছেন তাদেরকে সমর্থন করেছেন বা উৎসাহ দিয়েছেন।

তথাকথিত “জঙ্গি” কর্মকাণ্ড বা উগ্রতার সাথে তাদের কর্মপদ্ধতির পার্থক্য হলো অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কিন্তু শাস্তি বা বলপ্রয়োগের চেষ্টা না করা। তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, নসীহত করেছেন, ক্ষমতাসীন ও অন্যান্য সকলকে অন্যান্য দমন করতে, প্রতিবাদ করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, কিন্তু নিজে অন্যায় দমনের নামে শক্তি প্রয়োগ করেননি, আইন অমান্য করেননি, আইন নিজের হাতে তুলে নেন নি এবং আইন অমান্য করার ঘোর বিরোধিতা করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রকৃত সূফীগণ কখনোই সমাজ-বিমুখ বা রাজনীতি-বিমুখ ছিলেন না। “সূফী ইসলাম”-কে সমাজ, রাষ্ট্র ও জগৎ-বিমুখ বলে চিহ্নিত করা ও সকল সংস্কার আন্দোলনকে “ওহাবী” বলে চিত্রিত করার কোনো ভিত্তি নেই। তথাকথিত ‘ইসলামী সম্ভ্রাস’ বা জঙ্গিবাদের নেতৃত্বে উসামা বিন লাদেনের মত সৌদি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন বলে শোনা যায়। সৌদি আরবের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা এদের অর্থায়ন করেন বলে দাবি করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত উপমহাদেশে আহলে হাদীস ও দেওবন্দী-পদ্ধতির কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত দু-চার ব্যক্তির এর সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা শোনা যায়। এছাড়া এদের মধ্যে কবর-মাযার ইত্যাদির বিরোধিতা দেখা যায়। সর্বোপরি এরা নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য মৌখিক প্রচার ছাড়াও অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছেন। এজন্য অনেক গবেষক মনে করেন যে, ওহাবী মতবাদের প্রসারই বর্তমান জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ।

তবে লক্ষণীয় যে, উসামা বিন লাদেন-এর আন্দোলনের গোড়া পত্তন হয় সৌদি-ওহাবী রাষ্ট্রের বিরোধিতার মাধ্যমে। তার অনুসারীরা তথাকার রাজতন্ত্র, মার্কিন সৈন্য, অনাচার ইত্যাদির বিরোধিতা করেন এবং সৌদি রাষ্ট্র ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের বংশধরসহ সকল সৌদি আলিম বিন লাদেনের আন্দোলন ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার। সর্বোপরি, বিভিন্ন দেশের সংস্কার বা প্রতিরোধ আন্দোলনকে ‘ওহাবী’ বলে আখ্যায়িত করার কোনো ভিত্তি নেই। বস্তুত মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর আদর্শ প্রাপ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে তুর্কি খিলাফতের প্রচার ও ব্রিটিশ সরকারের সুযোগসন্ধানের কারণে। ওহাবী মতবাদ ও আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে একান্তই একটি আঞ্চলিক বিষয় ছিল। অন্যান্য মুসলিম দেশের সংস্কার-প্রতিরোধ ও ধর্মকেন্দ্রিক সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের মতই ভালমন্দ মেশানো একটি বিষয়। অন্যান্য দেশে মুসলিমগণ তাদের পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুসারে অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। যেহেতু ওহাবীগণ ও অন্যান্য দেশের মুসলিমগণ সকলেই একই সূত্র,

অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইসলামী ফিক্হ ও ইসলামের ইতিহাস থেকে নিজেদের মতামত সংগ্রহ করেছেন, সেহেতু তাদের মতামত ও কর্মের মধ্যে মিল থাকাই স্বাভাবিক। এ জন্য সকল কৃতিত্ব মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবকে দেওয়ার কোনো কারণ নেই। আফগানিস্তান ও ইরাকে বিন লাদেনের মতবাদ প্রসার লাভ করেছে। আর এ দুটি দেশই ঘোর ওহাবী বিরোধী। আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী হানাফী মাযহাবের কঠোর অনুসারী, পীর মাশাইখদের ভক্ত এবং ওহাবীদের বিরোধী। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের দীর্ঘ শাসনামলে ওহাবী বা অন্য যে কোনো সংস্কারমুখী আলিম ও মতবাদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র সূফীদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোরতা অবলম্বন করা হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুই দেশে জঙ্গিবাদের প্রসার থেকে বুঝা যায় যে, জঙ্গিবাদের কারণ অন্য কোথাও নিহিত রয়েছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, সন্ত্রাসীদের জাতি, ধর্ম গোত্র ইত্যাদিকে ঢালাওভাবে ‘সন্ত্রাসের’ কারণ বা চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা সঠিক নয়। এতে সন্ত্রাস দমনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, কোনো, জাতি, ধর্ম বা গোত্রের সকল মানুষকে তো আর ঢালাওভাবে বিচার করা যায় না। জঙ্গিবাদের দায়িত্ব ‘ওহাবী মতবাদের’ উপর চাপানোর বড় বিপত্তি হলো, এতে সমস্যা সমাধানের পথ হারিয়ে যাবে। কেননা, সৌদি ওহাবীদের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন, কারণ জঙ্গিবাদ তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। আর অন্য কোনো দেশের কেউ নিজেকে ওহাবী বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু প্রায় সকল ধর্মীয় দলই বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা ‘ওহাবী’ বলে আখ্যায়িত। প্রত্যেকেই দাবি করেন যে, তাঁরা সরাসরি কুরআন, হাদীস, ফিক্হ ও পূর্ববর্তী ইমামগণের মতের ভিত্তিতে তাদের মত ও দল গঠন করেছেন; মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের নিজস্ব কোনো মত তারা মানেন না। এমনকি সৌদি আরবের আলিমগণ কখনোই নিজেদেরকে ওহাবী বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবকে একজন সংস্কারক হিসেবে মনে করেন এবং তাঁর সকল মতামতই কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী ইমামগণের থেকে গৃহীত বলে দাবি ও প্রমাণ করেন।

ফুটনোট

[1] ড. ইবরাহীম জুমআ, আল-আতলাস আত-তারীখী লিদ-দাওলা আস-সাউদিয়াহ, ড. ইসমাঈল আহমাদ ইয়াগী, তারীখুল আলাম আল-ইসলামী পৃ. ৬৩-৭৮।

[2] গোলাম আহমাদ মোর্তাজা, ইসলামের ইতিহাস পৃ. ১৯১-১৯২।

[3] A.R Mallik; British Policy and the Muslim in Bengal p 78-79; গোলাম আহমাদ মোর্তাজা; ইসলামের ইতিহাস, ১৯৫-১৯৭; চেপে রাখা ইতিহাস, ২১১-২১২।